ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের সমস্যাবলী

কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা জারি করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরে ১৯৭৫ সালের ২০ জুন অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইউথ অরগানাইজেশন কর্তৃক আয়োজিত সারা বাংলা যুব সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে কমরেড শিবদাস ঘোষ তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে যে প্রধান সমস্যা, সেগুলি সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এদেশে বিপ্লব সংঘটিত করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য পূর্বশর্ত এবং পালনীয় কর্তব্যগুলির রূপরেখাও তুলে ধরেন। এই ভাষণের আগে শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান জননেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ — যিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁর 'সর্বাত্মক বিপ্লব'-এর ধারণাটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

কমরেড সভাপতি, শ্রদ্ধেয় জননেতা জয়প্রকাশ নারায়ণজি,
উপস্থিত যুবপ্রতিনিধিবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে ধৈর্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের একজন বর্ষীয়ান জননেতা জয়প্রকাশজির ভাষণ শুনলেন। আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর মতামত, তাঁর সর্বাত্মক ক্রান্তি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা তিনি যথাসম্ভব সহজ এবং সরলভাবে আপনাদের সামনে রেখেছেন। সর্বাত্মক বিপ্লবের যে কথা তিনি বলছেন, তার মূল লক্ষ্যটি যদি এই হয় যে, সাধারণ মানুষের সর্বাত্মক অগ্রগতি ও প্রগতির অর্থে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং গোটা দেশের একটা সর্বাত্মক উন্নতি ও অগ্রগতির দ্বার খুলে দেওয়ার জন্য, আমাদের দেশে বর্তমানে যে সমাজব্যবস্থা আছে, রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমন রয়েছে, সমাজের অর্থনৈতিক-সামাজিক যে ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে, সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেমন ধরনের চলছে, গণতান্ত্রিক 'ইন্‌স্টিটিউশন'গুলির যা চেহারা দাঁড়িয়েছে — এই সমস্ত কিছুর একটা আমূল পরিবর্তন আনা, অর্থাৎ বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন এবং তার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন, তাহলে সেখানে আমরা একমত। কিন্তু এই সর্বাত্মক বিপ্লব কীভাবে আসবে — তা নিয়ে তাঁর সাথে আমাদের মতপার্থক্য আছে। কিন্তু আন্দোলনের বর্তমান স্তরে সেটা এখনই একটা বড় কথা নয়।

গোটা সমাজব্যবস্থার এই আমূল পরিবর্তন আনার জন্য আমার কাছে এবং আমাদের দলের কাছে বর্তমান মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হচ্ছে, জনসাধারণের মধ্যে এবং যুবশক্তি ও ছাত্রশক্তির মধ্যে ধসে যাওয়া যে নৈতিক শক্তি টাকার কাছে, তুচ্ছ চাকরি পাওয়ার লোভের কাছে, সরকারি চোখ-রাঙানির কাছে, গুন্ডাবাজির কাছে, নানারকমের প্রলোভনের কাছে আজ তুচ্ছ কথায় যেভাবে আত্মবিক্রয় করছে — এই জনআন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার থেকে যুব-ছাত্র ও জনশক্তিকে নৈতিকভাবে মুক্ত করে একটি সঠিক রাজনৈতিক লক্ষ্য স্থির রেখে, নতুন উন্নত নৈতিক মান ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে তাদের সংগঠিত করা — যারা সমাজের এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনার জন্য একটা 'ডাইরেক্‌টিভ ফোর্স' বা 'মোটিভ ফোর্স' হিসাবে কাজ করবে। ফলে জয়প্রকাশজি জনতার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনশক্তি এবং ছাত্র-যুব শক্তিকে যে উন্নত নৈতিক মান ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাগ্রত হওয়ার কথা বলছেন, সেই জায়গাটায় আমরা জয়প্রকাশজির সঙ্গে একমত, যদিও এই নীতিনৈতিকতা সংক্রান্ত ও রাজনীতি সংক্রান্ত ধারণায় পরস্পর মতবিনিময় ও বোঝাপড়া গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে।

আমার সঙ্গে জয়প্রকাশজির যখন পাটনায় কথাবার্তা হয়', তখন আমি তাঁকে পরিষ্কার এই কথাটা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে যে সর্বাত্মক বিপ্লব তিনি আনতে চাইছেন, তা সম্ভব বলে তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায়, তার জন্যও তো দরকার একেবারে নিচুস্তর থেকে উঁচুস্তর পর্যন্ত জনগণের সচেতন, সংঘবদ্ধ, নৈতিকভাবে উন্নত, উন্নত সাংস্কৃতিক মানের আধারে সংগঠিত জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া। জনসাধারণের আন্দোলনের মধ্য থেকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং বিপ্লবের পরিপূরক উন্নত রুচি, নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতির আধারের ওপর একেবারে গ্রামের স্তর থেকে

জাতীয় স্তর পর্যন্ত যদি রাজনৈতিক গণকমিটির আকারে এই জনশক্তির আমরা জন্ম দিতে পারি — যাকে আমাদের মার্কসবাদী বা বিপ্লবী পরিভাষায় আমরা শোষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া বলি — তবেই তো সেটা এই সমাজ পরিবর্তনের একটা ডাইরেক্টিভ ফোর্স বা মোটিভ ফোর্স হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু, এই কাজ অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে 'অ্যাজিটেশনাল ফর্ম অব মুভমেন্ট' (নিছক প্রতিবাদী আন্দোলন) যতবার যত তীব্র আকারেই সংগঠিত করা হোক না কেন, শুধুমাত্র তার মধ্য দিয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অর্থাৎ আপনা-আপনি গড়ে উঠতে পারে না। পাটনাতে আলোচনার সময় আমার মনে হয়েছিল, তিনি আমার এই কথাটা সর্বতোভাবে মেনে নিয়েছিলেন।

এখন এই যে নৈতিকভাবে উন্নত এবং উন্নত সাংস্কৃতিক মানের আধারে সংগঠিত জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়ার কথা আমরা বলছি — এ কথার মানে তো এ নয় যে আমরা গোটা দেশের সমস্ত মানুষকে, শতকরা নব্বই ভাগ লোককে, একই সাথে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তুলতে পারব এবং একটা শক্ত নৈতিক ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম হব। কারণ, সমাজ অভ্যন্তরে নৈতিক অধঃপতন যা কিছু আমরা দেখছি, তা সমস্ত কিছুই ঘটছে বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য। ফলে, এই প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন আমরা বহু চেষ্টা ও কষ্টসাধ্য রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন কিছু মানুষকে নৈতিক ভিতের ওপর দাঁড় করাতে থাকব, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী জীবনযাত্রার এই সাধারণ পরিবেশে একই সাথে আরও লক্ষ লক্ষ লোকের নৈতিক অধঃপতন প্রতিনিয়তই ঘটতে থাকবে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকে থাকলে এই প্রক্রিয়া তো একইভাবে চলতে থাকবে। এমতাবস্থায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রেখে, সমাজ অভ্যন্তরে বেশিরভাগ লোকের, শতকরা নব্বই ভাগ লোকের, ধীরে ধীরে নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন সাধনের মারফত বিপ্লব আনার চিন্তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব। স্বভাবতই এই কাজটি করতে হলে রাজনৈতিক বিপ্লবের মারফত প্রথমে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। কিন্তু, যখনই মানুষ একটা সুস্পষ্ট আদর্শ, উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক লাইন এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হয়ে, শান্তিপূর্ণভাবে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন আনতে চাইবে, রাষ্ট্রশক্তি যদি তার সশস্ত্র দমনযন্ত্র নিয়ে তাকে রোখবার চেষ্টা করে, তখন কি সেই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ থাকবে ? ইতিহাস বলছে, থাকে না। কোথাও থাকেনি।

জয়প্রকাশজি বলছেন, এই পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ পথে হয় কি না, সেটা পরীক্ষা করতে দোষ কী ? আমি বলি, গান্ধীজিও এই জিনিস পরীক্ষা করেছেন। তিনিও যদি করতে চান, করুন। শুধু আমাদের অনুরোধ, গণআন্দোলনের মধ্যে গ্রামের স্তর থেকে শুরু করে মহল্লায়-মহল্লায়, কারখানায়-কারখানায়, স্কুল-কলেজে সর্বত্র যে গণসংগ্রাম কমিটিগুলি গড়ে উঠবে — সেগুলোকে এমন করে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তুলুন এবং এমন নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিতের ওপর গড়ে তুলুন, যাতে সশস্ত্র আক্রমণ যদি আসে তাহলে তারা তার প্রতিরোধ করতে পারে। তার জন্য শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে কষ্টসাধ্য রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একেবারে নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তর পর্যন্ত বিপ্লবের উপযোগী রাজনৈতিকভাবে সচেতন জনশক্তি ও যুব-ছাত্র শক্তি, অর্থাৎ এককথায়, জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া সর্বপ্রথমে আবশ্যক। আপনারা মনে রাখবেন, জনগণের বিক্ষোভকে নিয়ে বিক্ষিপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন অনেক সহজেই গড়ে তোলা যায়। কিন্তু, আমি যেভাবে জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়ার কথা বললাম, তা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য কাজ। এ বিষয়ে আমি আজ আর আপনাদের সামনে অধিক বক্তৃতা দিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। অনেকক্ষণ ধরে আপনারা অপেক্ষা করছেন। যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয়ও দিয়েছেন। আমি শুধু আমাদের দেশের মূল সমস্যাকে যেভাবে বুঝেছি, এখন খুব অল্প কথায় তা আপনাদের সামনে রাখব এবং এই অবস্থায় আপনাদের সামনে কর্তব্য কী, তাও সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব।

কী আমাদের সামনে মূল সমস্যা ? আমাদের সামনে মূল সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের শিল্পের অগ্রগতির ধারাকে আমরা অব্যাহত রাখতে পারছি না। শিল্পবিকাশের পথে বার বার মন্দার চাপ পড়ে তার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। উৎপাদনের ক্রমাগত অগ্রগতি ঘটাতে আমরা পারছি না। কলে কারখানায় ক্রমাগত লে-অফ ও ছাঁটাই হচ্ছে। আমাদের দেশ এমনিই গরিব দেশ। পুঁজি আমাদের কম। এই অল্প পুঁজি সত্ত্বেও যতটুকু উৎপাদিকা শক্তি আমাদের দেশে কলকারখানায়, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলিতে রয়েছে, তার শতকরা পঞ্চাশ

ভাগ উৎপাদিকা শক্তিকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। তা অলস হয়ে থাকছে। কেন ? ইন্দিরাজি বলছেন, আমাদের গরিব দেশ, পুঁজি কম — তাই শিল্পের অগ্রগতি হচ্ছে না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ইন্দিরাজির এই কথাটা গুরুতর আলোচনার বিষয়ই হতে পারে না এই কারণে যে, আমাদের দেশে প্রতিদিন ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে, কৃষিঅর্থনীতির মধ্য দিয়ে যতটুকু পুঁজি সঞ্চ য় হচ্ছে এবং শিল্পে যতটুকু উৎপাদিকা শক্তি রয়েছে, সেটা অলস হয়ে থাকছে কেন তাহলে ? যদি একথাই সত্য হত যে, পুঁজির অভাবে আমাদের দেশে শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না, বা উৎপাদন বাড়ছে না, তাহলে উৎপাদন করার যে শ্রমশক্তি এবং যন্ত্রপাতির শক্তি আমাদের দেশে কলকারখানায় মজুত রয়েছে, অনুন্নত দেশে তাকে অলস করে রাখা হচ্ছে কেন ? এখানে কলকারখানায় লে-অফ হচ্ছে কেন ? এই লে-অফ মানে তো উৎপাদিকা শক্তি অলস হয়ে পড়া। এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তাহলেই বোঝা যাবে, যথার্থই ইন্দিরাজি যে কথা বলছেন, সেই পুঁজির অভাবই আমাদের দেশে শিল্পের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নাকি, আমাদের দেশের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থাৎ উৎপাদনের মালিক-মজুর সম্পর্ক এবং সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের নীতি শিল্পের এবং উৎপাদনের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার আগে এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

আপনারা একটু বিচার করলেই দেখতে পাবেন, আমাদের দেশে শিল্পের অবাধ অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই বাধার মূল কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশের প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায় ? যেখানেই মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হয় এবং যেখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হ'ল সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন, তাকেই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়। সমাজের অগ্রগতি এবং জনগণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে উৎপাদনের নীতি নির্ধারিত হয় না। এখানে উৎপাদনের নীতি নির্ধারিত হয় সর্বোচ্চ লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই লাভ মালিকরা সংগ্রহ করে মজুরকে শোষণ করে, তার ন্যায্য মজুরি ফাঁকি দিয়ে। ফলে, এই অবস্থায় দেশের মানুষের, মজুরদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যেতে বাধ্য। আর, জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যেতে থাকলে আজকের দিনের বিশ্বজোড়া সঙ্কট-জর্জরিত পুঁজিবাদী বাজারে লাগাতার শিল্পের বিকাশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোনমতেই সম্ভব নয়।

অন্যদিকে আমাদের গ্রামগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন। আপনারা জানেন, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগই গ্রামে বাস করে। এই যে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ গ্রামে বাস করে, তাদের মধ্যে আবার শতকরা আশি থেকে তিরাশি ভাগ মানুষই হচ্ছে সর্বহারা, আধা-সর্বহারা। তারা যে কী অবস্থায় অমানুষের মত দিনাতিপাত করে, তার ফিরিস্তি আমি দিতে চাই না। রেডিও শুনে এবং খবরের কাগজ পড়ে তা বোঝা যাবে না। গ্রামের এই বেশিরভাগ লোকের সারা বছর কোন বাঁধা কাজ নেই। ফসল বোনবার এবং ফসল কাটার সময় ছাড়া বাকি সময় বেশিরভাগ লোকের কাজ থাকে না। এদের মধ্যে আবার অনেক লোক আছে, যাদের সারা বছরই কোন কাজ নেই। তারা দলে দলে কাজের খোঁজে শহরে গিয়ে শহুরে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে এবং সেখানে হয় কুলিগিরি করে, না হয় ভিক্ষাবৃত্তি করে কোনরকমে দিন কাটাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার কিছুদিন বাদে গ্রামে ফিরে আসছে। গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা এই আশি থেকে তিরাশি ভাগ লোকের, বলতে গেলে, কোন কিছু কেনবার ক্ষমতাই নেই। এই অবস্থায় আমাদের দেশে শিল্পের অগ্রগতি ঘটবে কী করে ? মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে, বাজারে চাহিদা না থাকলে, মাল উৎপন্ন করবে কেন পুঁজিপতিরা ? তাই তারা কী করছে ? তারা কম মাল তৈরি করে অল্প কিছু সংখ্যক লোকের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে লাভটা তুলে নিচ্ছে। তাই আমাদের দেশে শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের সামনে প্রধান সমস্যা হচ্ছে, শিল্পের এই লাগাতার উন্নতির দরজা কীভাবে খুলে দেওয়া যায়। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, আমাদের দেশের কৃষি-অর্থনীতির আধুনিকীকরণ ও বৈজ্ঞানিকীকরণ — যা না হলে শিল্প বিপ্লবের দরজা খুলে দেওয়া যায় না, যা না হলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যারা যুক্ত থাকে, তাদের আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রায় গড়ে তোলা যায় না। গ্রাম এবং শহরের মধ্যে আজ যে আসমান-জমিন ফারাক রয়েছে, তাকে দূর করা সম্ভব না। আজ আমাদের দেশে গ্রামগুলো যে সাপ-ব্যাঙ, ভুত-প্রেতের বাসস্থান হয়ে রয়েছে, তা দূর করে যদি আধুনিক গ্রাম বানাতে হয়, যদি শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করতে হয়, যদি এত বড় একটা দেশের খাদ্যসমস্যা দূর করতে হয়, তবে কৃষির আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ

দরকার। কিন্তু, বর্তমান যুগে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এটা এই কারণেই করা যায় না যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের জন্য এমনিতেই উৎপাদনের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাজারের অভাবে যতটুকু উৎপাদিকা শক্তি রয়েছে, তাই অলস হয়ে পড়ছে। শিল্পে লালবাতি জ্বলছে, লে-অফ, ছাঁটাই হচ্ছে। এই অবস্থায় কৃষিতে যন্ত্রীকরণ করতে গেলে যে লোকগুলি কৃষি অর্থনীতি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তাদের কাজ দেওয়া সম্ভব হবে না। যেখানে কাজ নেই বলে শহরে এমনিতেই বেকারের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে, সেখানে এই প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কৃষিতে যন্ত্রীকরণ করতে গেলে এক ধাক্কায় যে কোটি কোটি লোক বেকার হয়ে পড়বে, সেই বেকারবাহিনীর চাপ সামাল দেওয়া কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষেই সম্ভব নয়।

তাই আমাদের দেশের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর দল কংগ্রেস কী করছে ? তারা জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে অল্প অল্প জমি বন্টনের পরিকল্পনা নিয়ে খণ্ড খণ্ড জমির মধ্যেই গ্রামীণ মানুষগুলোকে যতদূর ও যতদিন সম্ভব আটকে রাখতে চাইছে। আর, তারা সবুজ বিপ্লবের টোটকা বের করছে। অর্থাৎ কৃষি অর্থনীতিতে হেকিমি করছে, কবিরাজি করছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যতদিন সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী করে রাখার জন্য গ্রামের বাড়তি জনসংখ্যাকে অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঐ জমির অর্থনীতিতেই আটকে রাখা। এই ষড়যন্ত্র এখানে হচ্ছে এবং একেই প্রগতিশীল কৃষি অর্থনীতির কার্যক্রম বলে চালানো হচ্ছে। দু-পাঁচ বিঘা জমি পাওয়ার লোভে অনেকেই আজ হয়তো একে প্রগতিশীল কার্যক্রম বলে মনেও করছেন এবং শাসকশ্রেণীর দুরভিসন্ধিমূলক চক্রান্তের ফাঁদে বুঝে হোক্, না বুঝে হোক্ পা দিচ্ছেন। কিন্তু, তাঁরা বুঝতেই পারছেন না যে পুঁজিবাদী শোষণের প্রক্রিয়ায় গরিব ও মধ্যচাষীর হাত থেকে জমি চলে গিয়ে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়েছে, বর্তমান পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা টিকে থাকলে এই জমিও তো একই প্রক্রিয়ায় আবার চলে যাবে। তাহলে, সাময়িকভাবে লোক ঠকানোর অর্থে এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অর্থে, শাসকশ্রেণীর কাছে এর তাৎপর্য যাই থাকুক না কেন, সত্যিকারের জনস্বার্থে গ্রামীণ সমস্যার কোন সমাধান এর দ্বারা হতে পারে না। উপরন্তু, শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত এই তথাকথিত প্রগতিশীল পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্যটি যে সঙ্কট-জর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ফ্যাসিবাদ গড়ে তোলার চক্রান্তেরই নামান্তর — আশ্চর্যের বিষয়, এই অতি সহজ কথাটাও প্রগতিশীল ও মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেয়, এমন অনেক বামপন্থী দলও ধরতে পারছে না বা বুঝতে চাইছে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে লাগাতার শিল্পবিপ্লবের দরজা খুলে দেওয়ার প্রশ্নটির সাথে কৃষির আধুনিকীকরণ ও বেকার সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি জড়িয়ে রয়েছে। আর, এরই সাথে জড়িয়ে রয়েছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য দূরীকরণ এবং দেশের সর্বাত্মক অগ্রগতি, অর্থাৎ দেশকে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করার প্রশ্ন। আপনারা কি মনে করেন, এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা ভারতবর্ষের বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে সম্ভব ? এই কথাগুলি বুঝতে হলে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বলতে কী বুঝি, উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে কী বুঝি — সে সম্বন্ধে আরও স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ধারণা আপনাদের থাকা দরকার। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আজ আর আমার সময় নেই। অন্যত্র বহু বক্তৃতায় এবং লেখায় আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমি শুধু যে কথাটা এখানে বলতে চাই, তা হচ্ছে, এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাটাকে যদি আপনারা পাল্টাতে চান, তাহলে কী করে একে পাল্টাবেন ? একে রক্ষা করছে কে ? আপনারা কি মনে করেন, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরা তাদের টাকার জোরে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে ? নাকি, শুধু গুন্ডাবাহিনী একে রক্ষা করছে ? গুন্ডারা কি সত্যিকারের সাহসী ? না। গুন্ডারা সত্যিকারের সাহসী নয়। তারা দলবদ্ধ ভাবে দুর্বলের ওপর হামলা করে। পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতায় বা মালিকের টাকায় যারা গুন্ডামি করে, অনেকে মনে করেন, তারা বুঝি খুব সাহসী। আসলে তারা কাপুরুষ। তারা সাহসী নয়। সাহসী হচ্ছে তারা, যারা দরকার হলে অন্যায় রোখবার জন্য পুলিশ-মিলিটারির সঙ্গে লড়ে। সাহসী হচ্ছে তারা, যারা দরকার হলে একা গুন্ডার মোকাবিলা করে জান দেয়। কাপুরুষের মতো যারা আক্রমণ করে, তাদের কেউ সাহসী যুবক বলে না। আমাদের বিবেকানন্দের, ক্ষুদিরামের, সুভাষচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের, শরৎচন্দ্রের, নজরুলের বাংলার যুবকদের আজ সেই আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে। তারা দশজনে মিলে একজনকে পেটায়, আর মনে করে তারা বীর, তারা মস্তান। তারা কি বীর ? যারা দুর্বলের ওপর হাত তুলতে ভিতর থেকে লজ্জা পায় না তারা কাপুরুষ। এই কাপুরুষতা হঠাতে হবে যুবকদের।

আমি শুনে অবাক হয়ে যাই, যখন জ্যোতিবাবু বলেন, কংগ্রেস তাঁদের আন্দোলন করতে দেয় না। পাড়ায় বেরোলে কংগ্রেসি গুন্ডারা তাঁদের মারে, সেইজন্য নাকি পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে আন্দোলন হচ্ছে না। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় আন্দোলনের পরিস্থিতি এই কারণে নেই যে, পাড়ায় পাড়ায় গুন্ডারা হামলা

করছে এবং পুলিশ তাদের পেছনে। আমি শুনে ঠাট্টা করে বলেছিলাম — হ্যাঁ, তাঁরা সেইদিনই বিপ্লব করবেন, যেদিন পুলিশ তাঁদের বাধা দেবে না, গুন্ডারা গুন্ডামি করবে না, কেউ তাঁদের বাধা দিতে আসবে না। এইভাবে কোন্ দেশে কবে বিপ্লব হয়েছে ? আসলে তাঁরা তাঁদের দলের কর্মীদের পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতায় কাপুরুষ বানিয়েছেন। তাই তাঁরা চান, আবার সরকারি গদিতে এলে পুলিশ যদি পেছনে থাকে, অথবা এমন আশ্বাস যদি তাঁরা কখনও পান যে, রাষ্ট্রশক্তি বা পুলিশ তাঁদের ওপর তেমন আক্রমণ চালাবে না, তাহলে তাঁরা আবার বীরত্ব প্রদর্শন করবেন। আমি যুবকদের এই রাজনীতি পরিত্যাগ করতে বলি।

আমি লেনিনের একটা কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিই। তিনি রাশিয়াতে একসময় বলেছিলেন, 'বেটার ফিউয়ার, বাট্ বেটার' অর্থাৎ কম লোক হোক্, কিন্তু মানুষের মত মানুষ হোক্। তারা যদি শুরু করে, আজ হোক্ কাল হোক্ — বিপ্লব হবেই। বিপ্লব হয়, যেমন ভিয়েতনামের মানুষ দেখিয়ে দিল। অথচ আমেরিকা কী না করেছে ভিয়েতনামে ? সে তার পুরো মিলিটারি শক্তি ভিয়েতনামে ব্যবহার করেছে। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যত অর্থ আমেরিকা খরচ করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি একটা ছোট্ট ভিয়েতনামের মানুষকে ঠাণ্ডা করার জন্য তারা খরচ করেছে। যুদ্ধ জাহাজ, নাপাম বোমা দিয়ে গোটা দেশটাকে তারা মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু, পেরেছে নাকি ভিয়েতনামের নওজোয়ানদের রুখতে ? পেরেছে নাকি সেখানকার বিপ্লবীদের মনোবল ভেঙে দিতে ? সেখানকার বিপ্লবীরা কি জ্যোতিবাবুদের মত একথা বলেছে যে, বোমাবাজি হচ্ছে, আমেরিকার মিলিটারির কামান-বন্দুক চলছে — এগুলো না হঠে গেলে আন্দোলন কি করে এদেশে হবে ? না, তারা একথা বলেনি। তাই এসব কথা যারা বলে, সেইসব মিথ্যা পার্টির মোহ আপনারা ত্যাগ করুন।

ভিয়েতনাম শিখিয়েছে, বিপ্লবের জন্য তিনটি শর্ত দরকার — (১) বিপ্লবের সঠিক রাজনৈতিক লাইন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শ, (২) সঠিক বিপ্লবী পার্টি, অর্থাৎ যে পার্টি যথার্থই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে, আর (৩) জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দৃঢ়বদ্ধ সংগ্রামী ফ্রন্ট। যখন এই তিনটি শর্ত গড়ে ওঠে একসঙ্গে, তখনই বুঝতে হবে বিপ্লবের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। অর্থাৎ বিপ্লবের জন্য এই তিনটি শর্ত একইসঙ্গে গড়ে ওঠা প্রয়োজন। শুধু জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে — এইটুকু হলেই হবে না। নাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষ এর আগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়েনি ? ভারতবর্ষের মানুষ লাখে লাখে মাঠে-ময়দানে এসে লড়েনি ? এদেশের চাষী-মজুর, ছাত্র-যুবরা প্রাণ দেয়নি ? বহুবার দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজকাঠামোর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। বরং প্রতিটি আন্দোলনের পর কী হয়েছে ? হতাশা-নিরাশায় জনসাধারণ ভুগেছে। বামপন্থী আন্দোলন, গণআন্দোলন দুর্বল হয়েছে, ছত্রখান হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, পুঁজিপতিরা শুধু ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে।

তাহলে শুধু ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করলেই হয় না। আন্দোলনের রাস্তা ঠিক কিনা, আন্দোলনের আদর্শ ঠিক কিনা, আন্দোলনের নেতৃত্ব ঠিক কিনা — আন্দোলনের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো বিচার করা একান্ত দরকার। তাছাড়া আন্দোলনের মধ্যে আরও অনেক জিনিস লক্ষ্য রাখতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, আন্দোলনের মধ্যে কোন্ কোন্ দল আন্দোলনের যে শত্রুপক্ষ, তার সাথে তলে তলে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। কারণ, আপনারা মনে রাখবেন, শত্রুপক্ষ বা বুর্জোয়াশ্রেণী গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে শুধু যে সরাসরি আঘাত করে তা নয়, তারা আন্দোলনের মধ্যে নিজেদের এজেন্টও রাখে। শত্রুপক্ষের এইসব এজেন্টরা জনগণের নানান দাবিদাওয়া নিয়ে বাইরে লোকদেখানো আন্দোলনের মহড়া দেয়, গণআন্দোলনের মধ্যে কখনও কখনও সত্যিকারের বিপ্লবীদের থেকেও অনেক বেশি জঙ্গি ভাব দেখায়। আবার একই সাথে তারা শত্রুপক্ষের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং সুযোগমত জনগণের সংগ্রামী ফ্রন্টে ফাটল ধরায়, বিভেদ সৃষ্টি করে। এইভাবে সত্যিকারের গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের হয়ে তারা কাজ করে। তাছাড়া, বর্তমান পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাটাকে পাল্টে ফেলার জন্য যে কাজটা করা আসল দরকার, গণআন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে সেই সংযুক্ত মোর্চা রূপে বিপ্লবের উপযোগী জনগণের সংগ্রামের নিজস্ব হাতিয়ার শ্রমিক-চাষীর সংগ্রামী গণকমিটিগুলি একেবারে নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তর পর্যন্ত কিছুতেই নানা অজুহাতে এইসব দল গড়তে দেয় না। তারা বরং তার পরিবর্তে যে কোন উপায়ে নিজেদের দলীয় শক্তিবৃদ্ধিকেই এবং জনতার ওপর তাদের প্রভাব বৃদ্ধিকেই জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া বোঝাতে চায় এবং শাসকদলবিরোধী বিভিন্ন পার্টিগুলির মধ্যে ওপরে ওপরে যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠে, তাকেই চিরকাল জনগণের সংগ্রামী ফ্রন্ট বলে চালাবার চেষ্টা করে। এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবী প্রস্তুতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এইসব দল কার্যকরী ও প্রত্যক্ষ বাধা সৃষ্টি করে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে কখনও কখনও যে মারমুখী লড়াই এরা পরিচালনা করে, তার দ্বারা জনতাকে

বিভ্রান্ত করে বিপ্লবী দল থেকে জনগণকে সরিয়ে রাখার চক্রান্ত করে। গণআন্দোলনের মধ্যে এরাই হচ্ছে ধুরন্ধর সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তি, যাদেরই বিপ্লবী শাস্ত্রে বলা হয় 'কম্প্রোমাইজিং ফোর্স বিটুইন লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল', অর্থাৎ শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি। বাইরের বুকনি এবং আচরণ দেখে এদের আসল চরিত্র সাধারণ মানুষ ধরতে পারে না। গণআন্দোলনের মধ্যে এদের চতুরতা এবং বিপ্লববিরোধী রাজনীতি উদ্‌ঘাটিত করে জনগণ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া যায় না।

এছাড়াও গণআন্দোলনের মধ্যে আর এক দল আছেন, যাঁরা বিপ্লবের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ করে কিছু শুরু করে দেওয়ার কথা বলেন। বিপ্লবের জন্য কষ্টসাধ্য রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের উপযুক্ত জনগণের রাজনৈতিক শক্তি ও সংগঠন গড়ে তোলার কোন প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনেই করেন না। তাঁদের ধারণা, বিপ্লবটা কোনরকমে একবার শুরু করে দিলেই তা আপনা-আপনি হয়ে যাবে। এভাবে যাঁরা ভাবেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা যথার্থই সৎ এবং বিপ্লবের প্রতি সত্যি সত্যি নিষ্ঠাবান। কিন্তু, তাঁরাও তাঁদের অজ্ঞতাপ্রসূত এইসব ধারণা ও আচরণের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবী প্রস্তুতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকরী বাধা সৃষ্টি করেন এবং উপযুক্ত প্রস্তুতি অর্থাৎ বিপ্লবের উপযোগী জনতার রাজনৈতিক শক্তি ও সংগঠন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চ য় করার আগেই অসময়ে রাষ্ট্রশক্তিকে আঘাত করে বিপ্লবের পক্ষে কোন সাহায্য তো করেনই না, উপরন্তু, বিপ্লবের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের হাতকেই শক্তিশালী করে তোলেন। তাঁদের জানা উচিত, বিপ্লবী পার্টি বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় — একথা ঠিক। কিন্তু, বিপ্লবটা করে জনসাধারণ। ফলে জনগণের মধ্যে বিপ্লবের উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তির জন্ম না দিতে পারলে বিপ্লব মুষ্টিমেয় পার্টি কর্মীর দ্বারা — তাঁরা যত সৎ ও নিষ্ঠাবান হোন না কেন — হতে পারে না। আর একথাও মনে রাখা দরকার, জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবের উপযুক্ত এই রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। এইসব জিনিস ধরবার জন্যই আপনাদের বিপ্লবী রাজনীতির অনুশীলন এবং রাজনৈতিক সচেতনতা দরকার।

আপনারা মনে রাখবেন, এইসব প্রশ্ন বিচার না করে যারা শুধু বলে, এখন আন্দোলন হচ্ছে, এখন কোন আলোচনা নয় — তারা হয় দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর কোন ইতিহাসই জানে না বা পড়ে থাকলেও কিছুই বোঝেনি। অথবা তারা হচ্ছে সব রাজনৈতিক ধুরন্ধর। তারা আন্দোলনে জনগণের সমস্ত কোরবানির সুযোগ নিয়ে শুধু উজির-নাজির আর মন্ত্রী হতে চায়। তারা জনগণের সরকারবিরোধী মনোভাবকে শুধু নির্বাচনে কাজে লাগাতে চায়। তারা গণআন্দোলনের মধ্যে একেবারে নিচের স্তর থেকে উপরের স্তর পর্যন্ত বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিকল্প শক্তির অর্থে জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে চায় না।

এই রাষ্ট্রশক্তি বলতে কী বোঝায়, তা আপনাদের ভাল করে জানা দরকার। আপনাদের জানা দরকার, এই রাষ্ট্রশক্তিই আসলে বর্তমানের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাটাকে রক্ষা করছে — যে কথাটা আলোচনা করতে করতে আমি অন্য আলোচনায় চলে গিয়েছিলাম। এই রাষ্ট্রশক্তির মূল তিনটি 'অর্গ্যান' বা স্তম্ভ, যাদের সাহায্যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাটাকে সে রক্ষা করে। রাষ্ট্রশক্তির এই মূল তিনটি অর্গ্যান বা স্তম্ভ হচ্ছে — সৈন্যবাহিনী, বিচারবিভাগ এবং পুলিশ সহ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের এই যে তিনটি অর্গ্যান, নির্বাচনে সরকার বদলের দ্বারা এর চরিত্র পাল্টায় নাকি ? আপনারা মনে রাখবেন, নির্বাচনে সরকার বদলের দ্বারা রাষ্ট্রের এই তিনটি অর্গ্যান-এর চরিত্র পাল্টায় না। নির্বাচনের মধ্য দিয়েই সরকার পাল্টানো হোক, 'ক্যু' [coup (ষড়যন্ত্রমূলক সামরিক অভ্যুত্থান)] করেই সরকার পাল্টানো হোক, অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টে দলবদল করেই সরকার পাল্টানো হোক — এই যে রাষ্ট্রের তিনটি অর্গ্যান, যা একটা যন্ত্রের মতন একটা বিশেষ ধাঁচায়, একটা বিশেষ রূপে, একটা বিশেষ ঢংয়ে গড়ে উঠেছে, তার পরিবর্তন হয় না। যেমন, একটা মেশিন বিভিন্ন পার্টস নিয়ে একটা বিশেষ ঢংয়ে তৈরি, একটা বিশেষ ধরনের কাজ করবার জন্য। অপারেটর, ইঞ্জিনিয়ার, মিস্ত্রি সেই মেশিনটাকে যেমনভাবেই চালাক — খারাপভাবে হোক, ভালভাবে হোক — ঐ মেশিন দিয়ে সেই ধরনের কাজই হবে, যে ধরনের কাজের জন্য মেশিনটি তৈরি। তেমনি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের মানসিক ধাঁচা, রীতিনীতি, গঠনপদ্ধ তি, তার আইনকানুন সংক্রান্ত ধারণা, গণতন্ত্র সংক্রান্ত ধারণা, দেশ সংক্রান্ত ধারণা, জনতা সংক্রান্ত ধারণা — সমস্ত কিছু পুঁজিবাদকে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে, পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসনকে রক্ষা করার জন্য একটা ধাঁচে তৈরি। আর, সরকার হচ্ছে এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের মিস্ত্রি বা অপারেটর মাত্র। ফলে, শুধু

সরকার বদলের দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্র পাল্টায় না। তাহলে, রাষ্ট্রের এই যে মূল তিনটি অর্গ্যানের সাহায্যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাটা টিকে আছে, গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে একেবারে নিচের স্তর থেকে ওপরের স্তর পর্যন্ত যে গণকমিটিগুলি গড়ে উঠবে, সেই গণকমিটিগুলি যদি রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং উপযুক্ত নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধারের ওপর এই তিনটি অর্গ্যানের কাজ করার উপযুক্ত করে গড়ে না তোলা যায়, তাহলে বিকল্প রাষ্ট্রশক্তির জন্ম হতে পারে না। আর, এই কাজটি না হলে শুধু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার বদল করে কোনদিন ক্রান্তি হবে না। আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি।

এই কাজটি না হওয়ার জন্যই ভারতবর্ষের মানুষ বারবার মার খাচ্ছে। তারা বারবার আন্দোলনে আসছে, বারবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আবার তারা আন্দোলনে আসবে। কিন্তু, এই কাজটি না হলে অতীতেও আন্দোলনগুলোর যে পরিণতি ঘটেছে, ভবিষ্যতেও আবার তাই-ই হবে। আমি শুধু আন্দোলনে পরাজয় হয়েছে বলেই এইকথা বলিনি। আমি জানি, সমস্ত দেশের বিপ্লবী নেতারাও জানতেন এবং এ যুগের একজন মহান বিপ্লবী নেতা তাঁর নিজের একটা বিখ্যাত লেখায় বলেছেন যে, সমস্ত দেশের বিপ্লবী আন্দোলনই প্রথমে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। আবার আসে তার পরাজয়। আবার আসে তার পরাজয়। আবার সে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। এইভাবে একটার পর একটা পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হতে শেষপর্যন্ত বিপ্লব বিজয়প্রাপ্ত হয়। এই কথাটার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি পরাজয় প্রথমে এইজন্যই হয় যে, বিপ্লবের পক্ষে জনসমর্থন যতই থাকুক এবং বিপ্লবের আয়োজনটা সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই হোক, আর শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের সংগঠনের রূপেই হোক — যে যে মতের পৃষ্ঠপোষকই হোন না কেন — প্রথম অবস্থায় দুর্দান্ত রাষ্ট্রশক্তির সাথে তুলনায় সে থাকে দুর্বল। ফলে, আঘাত আসে, পরাজয় আসে। কিন্তু, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক লাইন সঠিক থাকলে, নেতৃত্ব সঠিক থাকলে, প্রতিটি পরাজয়ের মধ্য দিয়ে জনশক্তি হয় আরও সংগঠিত, আরও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এবং জনগণের সংগঠন হয় আরও শক্তিশালী। ফলে, প্রতিটি পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চ য় করে। আর, প্রতিটি পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সে শত্রুশিবিরে ভাঙন ধরায়। শত্রুকে করে আরও দুর্বল। এইভাবে একদিকে এই লড়াইগুলোর মধ্য দিয়ে বিপ্লব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হতে হতে পরাজয়ের মধ্য দিয়েও ক্রমাগত শক্তি সঞ্চ য় করতে থাকে। আর, প্রতিক্রিয়াশীলদের নিজেদের সঙ্কট বাড়তে থাকে, অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে, তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সঙ্কট তীব্রতর হতে থাকে এবং নানা ধরনের সঙ্কটের মধ্যে পড়ে তারা ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে। ফলে, শেষপর্যন্ত বিপ্লব জয়যুক্ত হয়।

কিন্তু, আমাদের দেশে পরাজয়গুলি কি এইরকম ? আমাদের দেশে পরাজয়গুলির মধ্য দিয়ে কি বামপন্থী আন্দোলন আর বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমাগত শক্তি সঞ্চ য় করেছে নাকি? নাকি, প্রত্যেকটি পরাজয়ের পর আমরা গর্তে ঢুকে যাচ্ছি, আমাদের আন্দোলন ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে বিভেদ আসছে ? যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় একদম ডুবে গিয়েছিল, ভ্রান্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ভুল রাজনৈতিক লাইন ও নেতৃত্বের জন্য তারাই আবার বীরদর্পে ফিরে এসেছে। আপনারা জানেন, কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ আন্দোলন পরিচালনা করতে করতে পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকারি ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐ স্তরে যেখানে প্রধান কাজ ছিল, বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদের লক্ষ্যকে স্থির রেখে সকলে মিলেই একেবারে গ্রামের স্তর থেকে শুরু করে রাজ্য স্তর পর্যন্ত 'ওয়ার্কার্স-পেজেন্টস্ সোভিয়েট'-এর অনুরূপ চাষী-মজুর, যুব-ছাত্রদের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার গণসংগ্রাম কমিটিগুলি গড়ে তোলা, সেখানে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটির প্রতি তৎকালীন মোর্চার বৃহত্তম দল ও নেতা হিসাবে সি পি আই (এম) বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না। উলটে তাঁরা কী করলেন ? তাঁরা সেইসময়ে 'শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টে'র ভুল রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে — আদর্শগত সংগ্রাম নয়, আদর্শগত সংগ্রাম তো সোভিয়েটগুলোতেও চলবে — গায়ের জোরে, পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতায় মোর্চার অন্তর্ভুক্ত শরিক দলগুলির সংগঠনশক্তি খর্ব করার সংগ্রামেই নেমে পড়লেন। ফলে দেখা গেল, ঐ সময়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী লড়াই পরিচালনা হ'ল না। উলটে, কিছু পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে দলীয় প্রভাব বাড়াতে গিয়ে যত লড়ালড়ি শুরু হয়ে গেল মোর্চার অন্তর্ভুক্ত শরিক দলগুলির মধ্যেই একের সাথে অপরের, শ্রমিকের সাথে শ্রমিকের, গরিব চাষীর সাথে গরিব চাষীর। এরই ফলশ্রুতিতে আমাদের সেই যুক্ত আন্দোলনই ভেঙে গেল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় কবরে চলে যাওয়া কংগ্রেস আবার বীরদর্পে ফিরে এল। এইভাবে আমাদের সেই ঐক্যবদ্ধ

আন্দোলন বেশিদূর এগোতে পারল না। বরং আমাদের নিজেদের মধ্যেই ভাঙন এল। এইভাবেই দেখা যাচ্ছে, বারবার আন্দোলনের পর প্রতিক্রিয়াশীলরা, পুঁজিপতিশ্রেণীই শক্তিশালী হয়েছে।

তাহলে কোথায় আমাদের ভুল ? ঐ সেই কথা — আমাদের গণআন্দোলনগুলির সামনে রাস্তা, আদর্শ অর্থাৎ মূল রাজনৈতিক লাইন এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব সঠিক ছিল না। অর্থাৎ গণআন্দোলনগুলোর মধ্যে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল ছিল না। ফলে, জনগণের দাবিদাওয়া নিয়ে যত লড়ালড়ি এখানে হয়েছে, সেগুলি হয়েছে মূলত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই কতকগুলো সংস্কারের লড়াই, যেগুলোকেই জনসাধারণের মধ্যে 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে চালানো হচ্ছে। এরই ফলে এখানে যেমন আন্দোলন হওয়ার কথা, তেমনই হয়েছে। এই সমস্ত গণআন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে বিপ্লবের উপযুক্ত জনতার রাজনৈতিক শক্তি এখানে গড়ে ওঠেনি — 'সোভিয়েট'-এর অনুরূপ শোষিত জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার গড়ে ওঠেনি। তাহলে আন্দোলন পরিচালনার সময় এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে লক্ষ রাখতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, আন্দোলনের মধ্যে মূল রাজনৈতিক লাইন সঠিক কি না — অর্থাৎ তার মধ্যে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল আছে কি না। তাছাড়া, আন্দোলনের মধ্যে সঠিক নেতৃত্ব চিনে নেওয়ার জন্য এ জিনিসও লক্ষ্য রাখতে হয় যে, গণআন্দোলনের মধ্যে কোন্ দল বা কারা, এই আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার সোভিয়েট-এর অনুরূপ মজুর-চাষীর সংগ্রামী গণকমিটিগুলি গড়ে তুলতে আগ্রহী। আর, কারা জনগণের এই সংগ্রামী গণকমিটিগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানা অজুহাতে কার্যত বাধা সৃষ্টি করছে এবং তার পরিবর্তে দলীয় সংগঠন শক্তি এবং দলীয় প্রভাব বৃদ্ধিকেই জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া বুঝিয়ে জনতাকে বিপথে পরিচালিত করতে চাইছে। এসব ছাড়াও সঠিক নেতৃত্ব চিনে নেওয়ার জন্য আন্দোলনের মধ্যে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হয়, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের মধ্যে কোন্ দলের নেতা ও কর্মীরা পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক উন্নত রুচি, সংস্কৃতি ও নৈতিক মান প্রতিদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত করছে। বিপ্লবের মারফত বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে পালটে ফেলে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যদি এখানে প্রবর্তন করতে হয়, তাহলে গণআন্দোলনের মধ্যে এই জিনিসগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা আপনাদের একান্ত দরকার।

অথচ দেখুন, আমাদের সমাজটা যেখানে পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত এবং এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদই যেখানে বিপ্লবের প্রধান কাজ, সেখানে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) — এই দুই দলেরই রণনীতি ও রণকৌশল হচ্ছে ভিন্ন রকম। যেখানে শোষণ করছে পুঁজিপতিশ্রেণী বা বুর্জোয়াশ্রেণী, সেখানে তারা গোটা পুঁজিপতি বা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলছে না। তারা মাত্র গুটিকয়েক মুষ্টিমেয় একচেটে পুঁজিপতিদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে — এরা শত্রু। এর দ্বারা বাকি পুঁজিপতিদের তারা বন্ধু হিসাবে বোঝাতে চাইছে এবং এইভাবে জনতার ক্রোধ থেকে তাদের আড়াল করতে চাইছে। এই কথার মানে তো হচ্ছে, গোটা পুঁজিপতিশ্রেণীর, বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন-শোষণকে লোকচক্ষুর আড়াল করে রাখবার জন্য তার সমস্ত দায়দায়িত্ব বুর্জোয়াদের গুটিকয়েক মাথার মধ্যমণির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেওয়া। ইন্দিরাজির কায়দাও তো তাই। তিনি কী করছেন ? তিনি পুঁজিবাদের সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থে কতগুলো পরিকল্পনা করছেন। পুঁজিবাদের সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থে তাঁর এই পরিকল্পনার সাথে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের যখনই বিরোধ দেখা দিচ্ছে — যেটা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক — এবং তারা তাঁর বিরোধিতা করছে, তখন ইন্দিরাজিও এই গুটিকয়েক একচেটে পুঁজিপতিদের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে জনতাকে বিভ্রান্ত করছেন। তিনি জনতাকে বলছেন যে, সকলে তাঁকে পুঁজিপতিদের দালাল বলে, অথচ ঐ টাটা এবং বিড়লা তাঁর সমালোচনা করছে। ফলে, তিনি কতবড় পুঁজিবাদবিরোধী ! তাহলে ইন্দিরা কংগ্রেসের সাথে এইসব দলগুলির পার্থক্য কোথায় ? আর, এই যদি তাঁদের রাজনীতি হয়, তাহলে তাঁরা বিপ্লব কী করে করবেন এবং তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক জনতার রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান কী করে ঘটবে ?

আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী স্লোগান দেয়। মনে হয়, এইসব ছাত্র-যুবরা ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষাই নেননি। এঁদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁরা সৎ। কিন্তু, তাঁরা বুঝতেই পারছেন না যে, শিল্পের জাতীয়করণ আর শিল্পের সমাজতন্ত্রীকরণ এক জিনিস নয়। তাঁরা

বোঝেন না যে, এই জাতীয়করণ পুঁজিবাদেরই সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থে করা হচ্ছে, পুঁজিবাদের সামগ্রিক ব্যাপক স্বার্থের প্রয়োজনে হচ্ছে। আর, পুঁজিবাদের এই সামগ্রিক স্বার্থটা ব্যক্তিগত পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই বিরোধে এসে যায়। অথচ এই বিরোধকে চালাকি করে একদল ধুরন্ধর বোঝাতে চায়, এটা পুঁজিবাদের সঙ্গে বিরোধ। না। এটা ব্যক্তিগত একচেটিয়া পুঁজির ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থের সঙ্গে পুঁজিবাদের সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থের বিরোধ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে উৎপাদনের মালিক-মজুর সম্পর্ক এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ মুনাফার নীতি অপরিবর্তিত রেখে শিল্পের জাতীয়করণকে যারা সমাজতন্ত্র বলে চালায়, তারা আসলে ধুরন্ধর, শয়তান। তারা জনতাকে বিভ্রান্ত করে। তারা এইভাবে নিজেদের পুঁজিবাদবিরোধী সাজিয়ে সমস্ত জাতিকে বিভ্রান্ত করে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিতে চায় — যেমন করে দিয়েছিল হিটলার জার্মানিতে, যেমন করে দিয়েছিল মুসোলিনি ইটালিতে। ইতিহাসের এইসব নজির আমাদের সামনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত ছাত্র-যুবরা, বুদ্ধিজীবীরা কি এমন মূর্খ এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছেন যে, তাঁরা এই জিনিস বুঝতে পারছেন না ?

জার্মানিতে হিটলার স্লোগান তুলেছিলেন, জাতীয় সমাজতন্ত্র। ইটালিতে যে মুসোলিনির পার্টি ফ্যাসিবাদ এনেছিল, সেই মুসোলিনি কে ছিলেন ? — একজন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট। ইন্দিরাজি যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের স্লোগান দিচ্ছেন, এদের বুক্‌নিও তাই ছিল। ইতিহাসে প্রমাণ হয়েছে, জাতীয় সমাজতন্ত্রের এই তথাকথিত প্রগতি আর 'ওয়েলফেয়ার ইকনমিক প্রোগ্রাম'-এর (কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক কর্মসূচির) আড়ালে হিটলার জার্মানিতে জঘন্য নাৎসিবাদ বা ফ্যাসিবাদ প্রবর্তন করেছিলেন। যাঁরা ইতিহাসের ছাত্র, তাঁরা তা জানেন। তাই সেই ১৯৪৮ সালে আমি বলেছিলাম, যে ফ্যাসিবাদ একদিন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিজম-এর গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিজম এখন ফ্যাসিবাদের শেষ অবলম্বন। কথাটা ভারতবর্ষে আজ রূপ পেতে চলেছে।

আমি আজ আর অধিক বক্তৃতা দিতে চাই না। আপনাদের কাছে আমার সর্বশেষ আবেদন, আপনারা — যুবকরা, জনসাধারণ — যারা আন্দোলন চান, তাঁরা আন্দোলনের রাজনৈতিক লাইন এবং নেতৃত্বের প্রতি গুরুত্ব দেবেন এবং এই জিনিসগুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলবেন। আপনাদের এই আন্দোলনগুলোর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দাবি আদায় বা নির্বাচনী লড়াই পরিচালনা হবে না। এই আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে একেবারে নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তর পর্যন্ত জনসাধারণের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তির জন্ম আপনারা দেবেন। আপনাদের আমি আবার বলি, বিপ্লব মানে রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন। রাষ্ট্রশক্তি মানে ঐ তিনটি অর্গ্যান — সৈন্যবাহিনী, বিচারবিভাগ এবং পুলিশ সহ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এই তিনটি একই ধাঁচে বাঁধা। গণসংগ্রাম কমিটিগুলি গঠন করে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত এবং উন্নত নৈতিক মানের আধারে সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি, অর্থাৎ বিকল্প রাষ্ট্রশক্তির জন্ম যদি দেওয়া না যায়, তাহলে ক্রান্তি, বিপ্লব — সবই হচ্ছে একটা মিথ্যা কল্পনা।

আর আমি আশা করব, পশ্চিমবাংলার যুবকরা বিহার, গুজরাট বা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের যুবকদের পিছনে পড়ে থাকবেন না। একদিন ভারতবর্ষের মানুষ বলত — বাংলার যুবকরা ভারতকে পথ দেখায়। আজ প্রশ্ন হচ্ছে, সেই বাংলার যুবকরা কি ভারতকে ফ্যাসিবাদের পথ দেখাবে ? নাকি, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ দেখাবে ? এই কথাটা যুবকদের মধ্যে আপনারা পৌঁছে দেবেন। এইটুকু বলেই আজ আমার বক্তৃতা শেষ করলাম।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

১। ৬ এপ্রিল, ১৯৭৫ বিহারের পাটনায় শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষের গণআন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

২০ জুন ১৯৭৫ প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৫ সালের ২৪ জুন
পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।